Sanatan Dharma

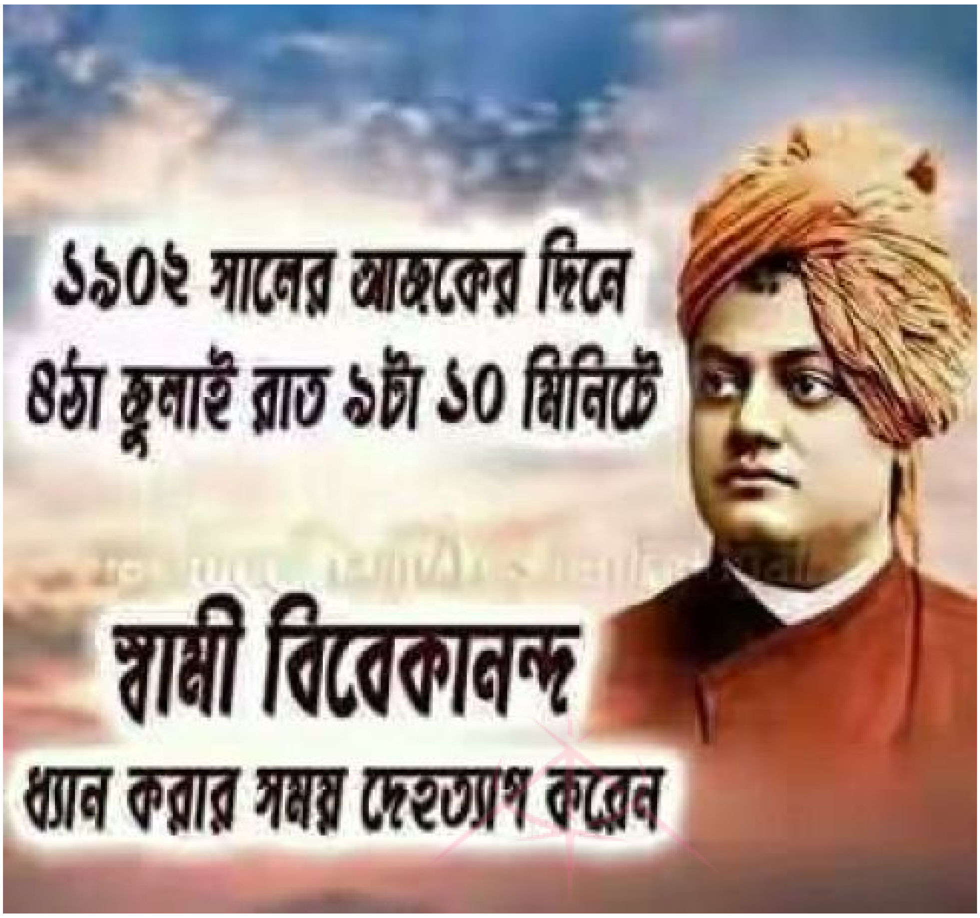

বিবেকানন্দ -দেহত্যাগ

কি হয়েছিল সেদিন ...
৪ঠা জুলাই, ১৯০২ শুক্রবার।
ভোরবেলা ঘুম ভাঙল বিবেকানন্দের । তাকালেন ক্যালেন্ডারের দিকে । আজই তো সেই দিন । আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস। আর আমার দেহত্যাগের দিন। মা ভুবনেশ্বরী দেবীর মুখটি মনে পড়ল তাঁর। ধ্যান করলেন সেই দয়াময় প্রসন্ন মুখটি। বুকের মধ্যে অনুভব করলেন নিবিড় বেদনা ।
তারপর সেই বিচ্ছেদবেদনার সব ছায়া সরে গেল ।
ভারী উৎফুল্ল বোধ করলেন বিবেকানন্দ। মনে নতুন আনন্দ, শরীরে নতুন শক্তি । তিনি অনুভব করলেন, তাঁর সব অসুখ সেরে গিয়েছে । শরীর ঝরঝর করছে । শরীরে আর কোনো কষ্ট নেই।
মন্দিরে গেলেন স্বামীজি । ধ্যানমগ্ন উপাসনায় কাটালেন অনেকক্ষন । আজ সকাল থেকেই তাঁর মনের মধ্যে গুন গুন করছে গান । অসুস্থতার লক্ষন নেই বলেই ফিরে এসেছে গান, সুর, আনন্দ । তাঁর মনে আর কোনও অশান্তি নেই । শান্ত , স্নিগ্ধ হয়ে আছে তাঁর অন্তর।
উপাসনার পরে গুরুভাইদের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করতে করতে সামান্য ফল আর গরম দুধ খেলেন । বেলা বাড়ল। সাড়ে আটটা নাগাদ প্রেমানন্দকে ডাকলেন তিনি। বললেন, আমার পুজোর আসন কর ঠাকুরের পূজাগৃহে । সকাল সাড়ে নটায় স্বামী প্রেমানন্দও সেখানে এলেন পূজা করতে । বিবেকানন্দ একা হতে চান ।
প্রেমানন্দকে বললেন, আমার ধ্যানের আসনটা ঠাকুরের শয়নঘরে পেতে দে ।

এখন আমি সেখানে বসেই ধ্যান করব ।

অন্যদিন বিবেকানন্দ পুজোর ঘরে বসেই ধ্যান করেন ।

আজ ঠাকুরের শয়নঘরে প্রেমানন্দ পেতে দিলেন তাঁর ধ্যানের আসন ।চারদিকের দরজা জানালা সব বন্ধ করে দিতে বললেন স্বামীজি।

বেলা এগারোটা পর্যন্ত ধ্যানে মগ্ন রইলেন স্বামীজি। ধ্যান ভাঙলে ঠাকুরের বিছানা ছেড়ে গান গাইতে গাইতে বেরিয়ে এলেন তিনি--

মা কি আমার কালো,

কালোরূপা এলোকেশী

হৃদিপদ্ম করে আলো ।

তরুন সন্ন্যাসীর রূপের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে গুরুভাইরা ।

বেলা সাড়ে এগারোটার মধ্যেই দুপুরের খাওয়া সারতে বললেন বিবেকানন্দ । আজ নিজে একলা খাচ্ছেন না । খেতে বসলেন সবার সঙ্গে ।

সকালবেলা বেলুড়ঘাটে জেলেদের নৌকো ভিড়েছিল । নৌকোভর্তি গঙ্গার ইলিশ । স্বামীজির কানে খবর আসতেই তিনি মহাউৎসাহে ইলিশ কিনিয়েছেন । তাঁরই আদেশে রান্না হয়েছে ইলিশের অনেকরকম পদ । গুরুভাইদের সঙ্গে মহানন্দে ইলিশভক্ষণে বসলেন বিবেকানন্দ । তিনি জানেন, আর মাত্র কয়েকঘন্টার পথ তাঁকে পেরোতে হবে । ডাক্তারের উপদেশ মেনে চলার আর প্রয়োজন নেই । জীবনের শেষ দিনটা তো আনন্দেই কাটানো উচিত।

'একাদশী করে খিদেটা খুব বেড়েছে। ঘটিবাটিগুলোও খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে ।' বললেন স্বামীজি। পেট ভরে খেলেন ইলিশের ঝোল, ইলিশের অম্বল. ইলিশ ভাজা ।

দুপুরে মিনিট পনেরো বিছানায় গড়িয়ে নিয়ে প্রেমানন্দকে বললেন, সন্ন্যাসীর দিবানিদ্রা পাপ। চল, একটু লেখাপড়া করা যাক । বিবেকানন্দ শুদ্ধানন্দকে বললেন, লাইব্রেরি থেকে শুক্লযজুর্বেদটি নিয়ে আয় ।

তারপর হঠাৎ বললেন, এই বেদের মহীধরকৃতভাষ্য আমার মনে লাগে না |

আমাদের দেহের অভ্যন্তরে মেরুদণ্ডের মধ্যস্থ শিরাগুচ্ছে, ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যবর্তী যে সুষুম্না নাড়িটি রয়েছে, তার বর্ণনা ও ব্যাখ্যা আছে তন্ত্রশাস্ত্রে । আর এই ব্যাখ্যা ও বর্ণনার প্রাথমিক বীজটি নিহিত আছে বৈদিক মন্ত্রের গভীর সংকেতে । মহীধর সেটি ধরতে পারেননি।

বিবেকানন্দ এইটুকু বলেই থামলেন ।

এরপর দুপুর একটা থেকে চারটে পর্যন্ত তিনঘন্টা স্বামীজী লাইব্রেরী ঘরে ব্যাকরণ চর্চা করলেন ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে ।

তিনি পাণিনির ব্যাকরণের সূত্রগুলি নানারকম মজার গল্পের সঙ্গে জুড়ে দিতে লাগলেন । ব্যাকরণশাস্ত্রের ক্লাস হাসির হুল্লোড়ে পরিণত হল ।

ব্যাকরনের ক্লাস শেষ হতেই এক কাপ গরম দুধ খেয়ে প্রেমানন্দকে সঙ্গে নিয়ে বেলুড় বাজার পর্যন্ত প্রায় দু মাইল পথ হাঁটলেন ।

এতটা হাঁটা তাঁর শরীর ইদানিং নিতে পারছে না । কিন্তু ১৯০২ এর ৪ ঠা জুলাইয়ের গল্প অন্যরকম । কোনও কষ্টই আজ আর অনুভব করলেন না।

বুকে এতটুকু হাঁফ ধরল না । আজ তিনি অক্লেশে হাঁটলেন । বিকেলে পাঁচটা নাগাদ মঠে ফিরলেন বিবেকানন্দ । সেখানে আমগাছের তলায় একটা বেঞ্চি পাতা । গঙ্গার ধারে মনোরম আড্ডার জায়গা । স্বামীজির শরীর ভাল থাকে না বলে এখানে বসেন না । আজ শরীর -মন একেবারে সুস্থ । তামাক খেতে খেতে আড্ডায় বসলেন বিবেকানন্দ ।

আড্ডা দিতে দিতে ঘন্টা দেড়েক কেটে গেল । সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টা হবে । সন্ন্যাসীরা কজন মিলে চা খাচ্ছেন । স্বামীজি এক কাপ চা চাইলেন ।

সন্ধ্যে ঠিক সাতটা। শুরু হলো সন্ধ্যারতি । স্বামীজি জানেন আর দেরি করা চলবে না । শরীরটাকে জীর্ন বস্ত্রের মতো ত্যাগ করার পরমলগ্ন এগিয়ে আসছে ।

তিনি বাঙাল ব্রজেন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন । ব্রজেন্দ্রকে বললেন , 'আমাকে দুছড়া মালা দিয়ে তুই বাইরে বসে জপ কর । আমি না ডাকলে আসবি না ।'

স্বামীজি হয়তো বুঝতে পারছেন যে এটাই তাঁর শেষ ধ্যান ।

তখন ঠিক সন্ধ্যে সাতটা পঁয়তাল্লিশ । স্বামীজি যা চেয়েছিলেন তা ঘটিয়ে দিয়েছেন । ব্রজেন্দ্রকে ডাকলেন তিনি । বললেন , জানলা খুলে দে । গরম লাগছে ।

মেঝেতে বিছানা পাতা । সেখানে শুয়ে পড়লেন স্বামীজি । হাতে তাঁর জপের মালা । ব্রজেন্দ্র বাতাস করছেন স্বামীজিকে । স্বামীজি ঘামছেন । বললেন , আর বাতাস করিসনে । একটু পা টিপে দে । রাত ন'টা নাগাদ স্বামীজি বাঁ পাশে ফিরলেন । তাঁর ডান হাতটা থরথর করে কেঁপে উঠল । কুন্ডলিনীর শেষ ছোবল । বুঝতে পারলেন বিবেকানন্দ । শিশুর মতো কাঁদতে লাগলেন তিনি । দীর্ঘশ্বাস ফেললেন । গভীর সেই শ্বাস । মাথাটা নড়ে উঠেই বালিশ থেকে পড়ে গেল । ঠোঁট আর নাকের কোণে রক্তের ফোঁটা । দিব্যজ্যোতিতে উজ্জ্বল তাঁর মুখ । ঠোঁটে হাসি ।
ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন , 'তুই যেদিন নিজেকে চিনতে পারবি সেদিন তোর এই দেহে আর থাকবে না ।'
স্বামীজি বলেছিলেন , 'তাঁর চল্লিশ পেরোবে না ।'
বয়সে ঠিক উনচল্লিশ বছর পাঁচ মাস, চব্বিশ দিন ।
পরের দিন ভোরবেলা ।
একটি সুন্দর গালিচার ওপর শায়িত দিব্যভাবদীপ্ত, বিভূতি-বিভূষিত, বিবেকানন্দ ।
তাঁর মাথায় ফুলের মুকুট ।
তাঁর পরনে নবরঞ্জিত গৈরিক বসন ।
তাঁর প্রসারিত ডান হাতের আঙুলে জড়িয়ে আছে রুদ্রাক্ষের জপমালাটি ।
তাঁর চোখদুটি যেন ধ্যানমগ্ন শিবের চোখ, অর্ধনিমীলিত, অন্তর্মুখী, অক্ষিতারা ।
নিবেদিতা ভোরবেলাতেই চলে এসেছেন ।
স্বামীজির পাশে বসে হাতপাখা দিয়ে অনবরত বাতাস করছেন ।
তাঁর দুটি গাল বেয়ে নামছে নীরব অজস্র অশ্রুধারা ।
স্বামীজির মাথা পশ্চিমদিকে ।
পা-দুখানি পুবে, গঙ্গার দিকে ।
শায়িত বিবেকানন্দের পাশেই নিবেদিতাকে দেখে বোঝা যাচ্ছে সেই গুরুগতপ্রাণা, ত্যাগতিতিক্ষানুরাগিণী বিদেশিনী তপস্বিনীর হৃদয় যেন গলে পড়ছে সহস্রধারে । আজকের ভোরবেলাটি তাঁর কাছে বহন করে এনেছে বিশুদ্ধ বেদনা ।
অসীম ব্যথার পবিত্র পাবকে জ্বলছেন, পুড়ছেন তিনি ।
এই বেদনার সমুদ্রে তিনি একা ।
নির্জনবাসিনী নিবেদিতা ।
বিবেকানন্দের দেহ স্থাপন করা হল চন্দন কাঠের চিতায় ।
আর তখুনি সেখানে এসে পৌঁছলেন জননী ভুবনেশ্বরী ।
চিৎকার করে কাঁদতে- কাঁদতে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে ।
কী হল আমার নরেনের ?
হঠাৎ চলে গেলে কেন ?
ফিরে আয় নরেন, ফিরে আয় ।
আমাকে ছেড়ে যাসনি বাবা ।
আমি কী নিয়ে থাকব নরেন ?
ফিরে আয় । ফিরে আয় ।
সন্ন্যাসীরা তাঁকে কী যেন বোঝালেন ।
তারপর তাঁকে তুলে দিলেন নৌকায় ।
জ্বলে উঠল বিবেকানন্দের চিতা ।
মাঝগঙ্গা থেকে তখনো ভেসে আসছে ভুবনেশ্বরীর বুকফাটা কান্না ।
ফিরে আয় নরেন ফিরে আয় ।
ভুবনেশ্বরীর নৌকো ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল ।
তাঁর কান্না, ফিরে আয় নরেন, ফিরে আয়, ভেসে থাকল গঙ্গার বুকে ।
নিবেদিতা মনে মনে ভাবলেন, প্রভুর ওই জ্বলন্ত বস্ত্রখণ্ডের এক টুকরো যদি পেতাম ! সন্ধে ছটা ।
দাহকার্য সম্পন্ন হল । আর নিবেদিতা অনুভব করলেন, কে যেন তাঁর জামার হাতায় টান দিল । তিনি চোখ নামিয়ে দেখলেন, অগ্নি ও অঙ্গার থেকে অনেক দূরে, ঠিক যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি, সেখানেই উড়ে এসে পড়ল ততটুকু জ্বলন্ত বস্ত্রখণ্ড যতটুকু তিনি প্রার্থনা করেছিলেন ।

নিবেদিতার মনে হল, মহাসমাধির ওপার থেকে উড়ে-আসা এই বহ্নিমান পবিত্র বস্ত্রখণ্ড তাঁর প্রভুর, তাঁর প্রাণসখার শেষ চিঠি।

--

Published on: Jul, 04 2023 09:12